১৯৯১ সালের সংসদ

নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

’৯১-এর নির্বাচনী ইশতেহার

পৃথিবীর মানচিত্রে সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক বিস্ময়কর ঘটনা ও অনন্য ইতিহাস। আবহমান কাল থেকে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী কখনো বা রাজা বাদশাহের হাতে, কখনো বেনিয়া ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে, আবার কখনো বা বিজাতি বা স্বজাতি স্বৈরাচারী শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর হাতে চরমভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে আসছে। দেশ, রাষ্ট্র, শাসক ও ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে বারবার, কিন্তু মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি তেমন করে, যেমন করে তারা প্রত্যাশা করেছে। আশা ভঙ্গের বেদনা তাই বারবার তাদের হতাশ করেছে, ক্ষুব্ধ করেছে। তবু বারবার তারা শুভ দিনের আশায় আবারও বুক বেঁধেছে– প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রাম ও লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায়।

এমনি করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এই ভূখণ্ডের বাঙালিরা ১৯৭১ সালে এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ছিনিয়ে আনলো স্বাধীনতা– সৃষ্টি হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ– আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

এই স্বাধীনতা হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ২৩ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলশ্রুতি এই স্বাধীনতা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এই জাতীয় চেতনার ক্রমবিবর্তনের ধারায় চুয়ান্নর নির্বাচনে জনগণের ঐতিহাসিক রায়, বাষট্টির আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়, সর্বশেষে ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ– প্রতিটি ঐতিহাসিক লগ্নে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতিকে জুগিয়েছিল অদম্য সাহস ও অনুপ্রেরণা।

৭ই মার্চে ঢাকা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে উপমহাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তুত করে স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি। এ আহ্বানে অকুতোভয়ে সাড়া দেয় বাংলার আপামর জনসাধারণ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহ। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জনগণকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম। এই ঘোষণার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নং সড়কস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কারাগারে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়। ২৫শে মার্চ দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। এই সরকার ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ নয় মাস এই আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনীর প্রত্যাহার সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার ফলে। এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে নজিরবিহীন।

আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতার পর পেয়েছে এক বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্ধ কল-কারখানা, শূন্য কোষাগার, শূন্য বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল, স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক কোটি মানুষের পুনর্বাসনসহ অসংখ্য সমস্যা।

স্বাধীনতা লাভের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ,

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ, দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালায়। অতি স্বল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য, আদর্শ ও স্বপ্ন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশ সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতি– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছিল মূল লক্ষ্য।

* আমাদের স্বাধীনতার মূল চেতনা বাঙালি জাতিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পুষ্টি সাধনের মাধ্যমে আমাদের আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতিসত্তার মর্যাদা চির অম্লান রাখা এবং বাঙালি জাতিকে আপন মহিমা ও গৌরবের সুদৃঢ় ভিত্তিতে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করা।

* অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ ও বৈষম্যের নিরসন করে বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মানসিকতার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন।

* বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং একে অপরের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কোন বাধা বা বিঘ্ন ঘটাতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা। রাষ্ট্রনীতি হবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উপজাতি বিশেষে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে না। প্রতিটি নাগরিকের প্রতিভা বিকাশের সম-সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার এটাই মর্মবস্তু।

আপামর জনসাধারণের উল্লেখিত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে রচিত হয়েছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে, জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে বদলে যায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সাংবিধানিক নীতিমালা। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নয়, বরং হত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র হয় ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া। জনগণ নয়, বন্দুকের নলই হয়ে ওঠে এদের ক্ষমতার মূল উৎস– উচ্চাভিলাষী জেনারেলরা ক্ষমতায় টিকে থাকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিরীহ সৈনিকদের, কিছু সংখ্যক সুযোগ-সুবিধাবাদী আমলা ও তাদের সহযোগী ধনিক শ্রেণীকে। এরা ক্ষমতাসীন হয়ে ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য নীতি-আদর্শহীন রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সমাহার ঘটিয়ে এবং ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে, নির্বাচনের নির্লজ্জ প্রহসন করে– কিন্তু দেশে গণতন্ত্র আসে না, কায়েম হয় না গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় ১৫ বৎসর যাবত ক্ষমতাসীন সরকারসমূহ ও শাসকগোষ্ঠী সংবিধানের মূলনীতিগুলো পাল্টিয়ে এমন একটি অবৈধ শাসন ব্যবস্থা চালু করে যার মূল বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির মাধ্যমে কলুষিত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি, নির্বিচারে মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁসি, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পুনর্বাসন এবং সার্বিক দুর্নীতি। আইনের শাসন ছিল অনুপস্থিত, জনগণের জানমালের ছিল না নিশ্চয়তা, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল রহিত, যার অনিবার্য পরিণতিতে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

এই অস্বস্তিকর দেউলিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আবার বাংলার নির্যাতিত ও অধিকারহারা মানুষ গর্জে উঠেছে চিরন্তন ধারায়, রচনা করেছে গণ-অভ্যুত্থানের আর একটি কালজয়ী উপাখ্যান। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বজ্রকণ্ঠে তারা ঘোষণা করেছে স্বাধীনতার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প। ছাত্র, পেশাজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে, আত্মাহুতি দিয়েছে নূর হোসেন, মইজুদ্দিন, সেলিম, দেলোয়ার ও মিলনের মতো অগণিত দেশপ্রেমিক বাঙালি।

আজকের এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ব্যাপক জনগণের প্রত্যাশা ও সময়ের দাবি পূরণে এবং ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে গণমানুষের সংগ্রামী সংগঠন– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের সুমহান কর্তব্য রয়েছে। এই অবস্থা, প্রেক্ষিত ও পটভূমিতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছে এই নির্বাচনী ইশতেহার– '৯১ তথা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি।

রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক রূপরেখা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিম্নে বর্ণিত রাজনৈতিক আদর্শ ও মৌলিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিশ্বাসী।

* জনগণের সার্বভৌমত্বই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। এই মূল আদর্শের পরিপন্থি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে কোন প্রক্রিয়া অবৈধ বলে বিবেচ্য।

বাংলাদেশে একটি জনপ্রতিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা কায়েমসহ সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি প্রবর্তন করা। এতদুদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সাংবিধানিক ও আইনগত পন্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন, পরিবর্তন ও ক্ষমতার হস্তান্তর নিশ্চিত করা।

* উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে ১৯৭২ সালের সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী পূর্বাবস্থায় পুনর্বহাল করা।

* বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ প্রতিটি মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করা ও আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা। গণপ্রচার মাধ্যমসমূহের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

* আইনের শাসনকে সমুন্নত করা ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

* সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি সকল নিবর্তনমূলক আইন ও কালাকানুন বাতিল করা।

জাতিসত্তার সংরক্ষণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সাধন

স্বদেশ ও স্বমণ্ডলে স্বকীয় সত্তায় বাঁচা ও জীবন ধারণের এক মহতি ইচ্ছা ও অদম্য স্পৃহার মধ্য দিয়েই দ্বিজাতিভিত্তিক পাকিস্তান থেকে বাঙালি জাতিভিত্তিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছে। বস্তুত এ দেশের মাটি, মাতৃভাষা ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত আমাদের হাজার বছরের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও স্বপ্ন-কল্পনার ক্রম বিবর্তনের ধারায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের নামই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কালের আবর্তে আমাদের এই জাতিসত্তার বিস্তৃত পটভূমি এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল মর্মবাণী এবং চেতনার মূল ভিত্তি যাতে ধসে না পড়ে, তা সতর্কতা ও সচেতনার সাথে রক্ষা করা হবে।

স্বাধীনতা ও তার মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধ্যান-ধারণার বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের সেই হাজার বছরের লালিত স্বপ্নসাধ ও চিন্তা-চেতনার প্রতীক। শত প্রতিকূল পরিবেশে চরম নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েও একে ধরে রাখতে হবে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা ও তার বিকাশ সাধনের সুযোগ পেয়েছি। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার জন্য আত্মনিয়োগ করবে এবং বাঙালি জাতির ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে কোন চক্রান্ত রুখে দাঁড়াবে। বাংলা ভাষাকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উপযুক্ত মর্যাদা **দেয়া** হবে এবং রাষ্ট্রীয় ও সরকারি সংস্থায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর উপযুক্ত ভূমিকা পালনের বিষয়ে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হবে।

গণমানুষের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে সত্যিকার বাঙালি জাতীয়তাবোধ যাতে রূপ পায় এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি যাতে গণমানুষের জয়যাত্রার সহায়ক হয়, সে লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবে।

বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতা হত্যার বিচার

বাংলা ভাষা, বাঙালি, জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু– এই চারটি শব্দ দিয়ে গাঁথা মালা আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলার দুর্জয় তারুণ্যের প্রতীক। জীবন-যৌবনের ১১টি বছর জেলখানায় কাটিয়ে ১৩টি মিথ্যা ফৌজদারি মামলার আসামি হয়ে এবং একবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং আরেকবার মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়েও কখনও স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যাচার-অবিচারের নিকট তিনি মাথা নত করেননি। তিনি ছিলেন অকুতোভয় বাঙালির এক যুগশ্রেষ্ঠ মহানায়ক। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার মহান স্থপতি। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজ আর শুধু একটি নাম মাত্র নয়– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মানে একটি নীতি, একটি আদর্শ, একটি আন্দোলন, একটি সংগ্রাম, একটি বিপ্লব, একটি বিদ্রোহ, একটি জাতি, একটি দেশ, একটি স্বাধীনতা ও একটি সংবিধান।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ করে বঙ্গবন্ধু যখন স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে পা বাড়ালেন, ডাক দিলেন দ্বিতীয় বিপ্লবের, তখন দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা এক জোট হয়ে বঙ্গবন্ধু গৃহীত বৈপ্লবিক কর্মসূচিকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তার জীবনের উপর হানলো চরম আঘাত। সাম্রাজ্যবাদের নীল নকশা অনুসারে তারা পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর প্রায় অরক্ষিত বাসভবনে সশস্ত্র হামলা চালায়। ভাড়াটে দুর্বৃত্তরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে, হত্যা করে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি ও বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে। সেখানেই ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষান্ত হয়নি– ৩রা নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে চার জাতীয় নেতা সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকেও তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই ট্রাজেডি আমাদের জাতীয় জীবনে এক কলংকজনক অধ্যায়।

১৯৭৫-উত্তর সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে খুনিদের আইনসম্মত শাস্তির বিধান হতে পরিত্রাণ দেবার বন্দোবস্ত করে। স্বঘোষিত খুনিদের তাদের প্রাপ্য শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবার হীন প্রচেষ্টা সংবিধানকে লঙ্ঘন ও তার অবমাননার সমতুল্য। সংবিধান লঙ্ঘনকারীদের প্রতি জাতির জিজ্ঞাসা– কী অধিকারবলে সংবিধানের পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করে খুনিদের বিচার থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের দেশে-বিদেশে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টায় সচেষ্ট

হলো? এমনকি বিচারপতি সায়েমের শাসনের সময় জেল হত্যার বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠিত হলেও আজও তার প্রতিবেদন দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করা হয়নি।

তাই কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে যাতে কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও সন্ত্রাসী ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাতে না হয় সেজন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে খুনিদের আইনানুগ বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, যাতে সরকার বা ক্ষমতার পরিবর্তন শুধু সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংগঠিত হয়, খুন বা হত্যালীলার মাধ্যমে নয়।

অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে মূল দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন দর্শন

অভূতপূর্ব গণজাগরণের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটলেও স্বৈরশাসনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া পড়েছে গোটা অর্থনীতিতে। প্রবৃদ্ধি হারের নিম্নগতি, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অবনতিশীল দারিদ্র্য, প্রকটতর বেকারত্ব, উত্তরোত্তর পরনির্ভরশীলতা– আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে দ্রুত উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর না হতে পারলে শুধু যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিই চরমভাবে বিপন্ন হয়ে উঠবে তাই নয়, গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকেও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন হবে। অতীতে সম্পদের অপচয়, পুঁজি পাচার, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগকে উৎসাহ না দিয়ে অনুৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। এই উপলব্ধিতে আজ সকল দেশবাসীকে ন্যূনতম ঐকমত্যের জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচিতে একত্রিত হতে হবে। উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারায় ন্যায়সংগত সামাজিক বণ্টন, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জন– চারটি মূল ধারায় নিয়োজিত হতে হবে সকল উন্নয়ন প্রয়াস। রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র ও জনসাধারণকে একই সাধারণ লক্ষ্যে পরিচালিত করাই হবে আজকের যুগের উন্নয়ন দর্শনের মূল কথা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করা হবে। প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও সামাজিক উপযোগিতার নিরিখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অগ্রাধিকার নির্ণীত হবে। এই লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের

পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ-সুবিধা যাতে সবাই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে এই বাজার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়কের– নিয়ন্ত্রকের নয়। সাধারণভাবে কোন ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।

ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও হবে গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান অদক্ষতা ও অনভিপ্রেত অলাভজনকতা দূর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, প্রতিযোগী বাজার ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ ধারায় উৎপাদনশীলতা দ্বারা এদেরকে লাভজনক করতে হবে।

উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ

বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় যে কোনো উন্নয়ন কৌশলের প্রধান দুই লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য নিরসন এবং ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জন। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আশির দশকের ক্রমাবনতশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে দ্রুত বৃদ্ধি করা। উহারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট জাতীয় উৎপাদনের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৩.৮ শতাংশ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যমাত্রাকে ৫ শতাংশ ধরা হয়েছিল। যদি এই লক্ষ্যমাত্রা ধরে অগ্রসর হই তা হলেও বর্তমানে ভারতের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের স্তরে পৌঁছাতে আমাদের লাগবে ২০ বছর, আর থাইল্যান্ডের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের স্তরে পৌঁছাতে লাগবে ৬০ বছর। এর থেকেই প্রবৃদ্ধির হার দ্রুততর করার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দারিদ্র্য নিরসনে, দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে, পরনির্ভরতা হ্রাসকল্পে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে বেগবান করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প আমাদের সামনে আর খোলা নেই। রিলিফ, ভর্তুকি, অনুদান, সাহায্য-ভিক্ষা দ্বারা সাময়িকভাবে স্থিতিশীলতা অর্জন অথবা দারিদ্র্যের ক্ষণস্থায়ী রোধ হয়তো করা যায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিসরে তা অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনতে পারে না।

দারিদ্র্য নিরসনের কৌশলকে হতে হবে বহুমুখী, বাস্তবানুগ এবং সামগ্রিক উন্নয়ন ধারার সাথে সংগতিপূর্ণ। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে কার্যকর দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন অত্যাবশ্যক। দারিদ্র্যসীমার নীচে নিপতিত অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেহেতু গ্রামাঞ্চলে বাস করে সেহেতু গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক পুনরুজ্জীবন আশু কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে উন্নত ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি ও উন্নত প্রযুক্তির কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ঐ সব খাতে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার দারিদ্র্য নিরসনের বাস্তব ভিত্তি সম্প্রসারিত করবে। প্রবৃদ্ধি-মুখীন এই প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর যে অংশ অবহেলিত থাকবে তাদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মূলত সমাজের চরম দরিদ্র অংশই ঐ সব কর্মসূচির আওতায় আসবেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে কষি খাতমুখীন ঋণ ও প্রশিক্ষণ নির্ভর কর্মসংস্থান কর্মসূচি নিতে হবে। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় যথা সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে ঐ সব কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্ভব এবং কোন্ ধরনের কাঠামোর মাধ্যমে ঐ সব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে তা নির্ধারণে দক্ষতা ও উপযোগিতাই হবে সবচাইতে বড় মাপকাঠি।

ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির জন্য বর্তমান আপৎকালীন কৃচ্ছ্রসাধন মানসিকতার মতো সকল দেশবাসীর ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। যদি আমরা আমাদের উন্নয়নের পথের অনিবার্য কৃচ্ছ্রসাধন ও ক্লেশকর প্রাথমিক ধাপটি পরস্পরের সাথে ভাগ করে নিতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই সম্ভব দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জগৎ সভায় একটি সম্মানজনক অবস্থানে গিয়ে পৌঁছানো।

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার

ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশ ঘটানোর গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এই সাহায্য যাতে জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহে যথাযথ নিয়োজিত হয় সেজন্য চাই: দক্ষ পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, অপচয় রোধ, সাহায্যের উৎপাদনমুখী ব্যবহার।

কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বৈদেশিক সহায়তাই আমরা গ্রহণ **করবো**। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যকে কেন্দ্র করে অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টির প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ

ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিয়োগযোগ্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এমনকি বৈদেশিক সাহায্যের উত্তরোত্তর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সৃষ্টিতে বর্ধিত হারে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হলে বৈদেশিক সাহায্যের ফলপ্রসূ ব্যবহার– যার উপর উন্নয়ন কাজ অধিকাংশে নির্ভরশীল– তার সফল বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ জন্য রাজস্ব ও কর নীতিকে পুনর্বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। কৃচ্ছ্রসাধন, অপচয় রোধ ও অনুৎপাদনশীল সরকারি ব্যয় ন্যূনতম মাত্রায় কমিয়ে এনে রাজস্ব ব্যয় কাঠামোর উৎপাদনমুখিনতা বৃদ্ধি করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় বণ্টন ব্যবস্থায় অপচয় রোধ ও অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় পরিহার করার পাশাপাশি কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বিদ্যমান কর কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে কর-ভিত্তি সম্প্রসারিত করবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঋণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজনে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে। আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করার জন্য ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দক্ষ, উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। সেই সাথে ঋণ বিতরণে দীর্ঘকালের জমে ওঠা অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দূর করতে হবে। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও জাতীয় খাতের উন্নয়নের স্বার্থে যারা বৃহৎ স্বেচ্ছাচারী খেলাপি ঋণগ্রহীতা, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এর ফলে যেমন উৎপাদনমুখী বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পাবেন,

তেমনি মেয়াদ-উত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ আদায়, দক্ষতা ও সামাজিক উপযোগিতার মাপকাঠিতে ঋণ বরাদ্দের নীতি বাস্তবায়নের ফলে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত ঋণ বরাদ্দে উৎপাদনশীল খাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টিও এই সূত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সঠিক মুদ্রানীতি, সুদের হার ও তার কাঠামো, সঞ্চয় হার এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদের হারে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। সেই সাথে দেশের পুঁজি বাজারের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সঞ্চয় অভ্যাসকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে হবে। সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে।

কৃষি খাত

খাতওয়ারি উন্নয়ন কৌশলের প্রসঙ্গে প্রথমেই এসে পড়ে কৃষি খাতের কথা। ’৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে কৃষির প্রবৃদ্ধি হারে মন্দা দেখা দেয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কৃষিতে বাৎসরিক উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দে ক্রমান্বয়ে সংকোচন। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিতে বাৎসরিক উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ও কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে এবং উচ্চফলনশীল আবাদের প্রসার ঘটাতে হবে। এর ফলে গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর অবস্থার উন্নয়নও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শস্য খাতে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য, গবাদি পশু ও অন্যান্য অকৃষি খাতের বিকাশ ত্বরান্বিত করা হবে এবং দারিদ্র্য নিরসনে তা প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে। কৃষির আধুনিকীকরণের কর্মসূচির আলোকে কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ, কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষি উপকরণ মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে উপযোগী বণ্টন ব্যবস্থা, ভর্তুকি, সংগ্রহ, বাজার ও গুদামজাতকরণ নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণ পুনরুদ্ধারকল্পে সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ পরিহার করতে হবে– তারা যাতে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ পান এবং সেই ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য যথোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

* কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যুক্তিসংগত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

* দেশে হালচাষ উপযোগী গবাদি পশুর স্বল্পতা কৃষিকাজের এক বিরাট অন্তরায়। অপরদিকে গো-খাদ্যের অভাব এবং গোচারণভূমির অপ্রতুলতা এ ক্ষেত্রে চরম অসুবিধার সৃষ্টি করছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে গবাদি পশুর মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিল্প খাত

উন্নয়নশীল বিশ্বের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণীর উপস্থিতি, বাজারের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র, পুঁজির বাজারের নির্দিষ্ট বিকাশ ছাড়া সফল শিল্পায়ন প্রয়াস সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জন্য মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোতেই শিল্পায়নের বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রকৃত শিল্পোদ্যোক্তা-নির্ভর শক্তিশালী বেসরকারি খাতের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি পরিহার করা হবে। দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা, জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ হবে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির মাপকাঠি। উন্নয়ন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারি শিল্প-কারখানার ভূমিকা সন্তোষজনক নয় এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ আদায়ের হারও খুবই নাজুক। অন্যদিকে, সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ধস নামার কারণে রাষ্ট্রীয় খাতও তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। দক্ষ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় খাত পরিচালনা এবং যোগ্য শিল্পোদ্যোক্তাদের হাতে বৃহদায়তন-ক্ষুদ্রায়তন বেসরকারি খাতের বিকাশ– এই দুই উপাদানের সঠিক সমন্বয়ই হবে শিল্প নীতির বৈশিষ্ট্য।

রপ্তানিমুখীন শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের সকল প্রকার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই খাতকে জরুরি খাত হিসেবে ঘোষণা করে উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই পদক্ষেপ শুধু বর্তমান রপ্তানিমুখী শিল্পকেই উৎসাহিত করবে না, বিদেশি শিল্প বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করবে। দেশের শিল্পায়নের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি নীতি, শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরামর্শ ব্যবস্থা, ভৌত অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের ভেতরে শিল্পায়নের উপযোগী পরিবেশ গড়ে

উঠলে বিনিয়োগকারীরা আস্থা খুঁজে পাবেন এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগও এ দেশের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হবে।

বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নিচ থেকে শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় যথাসাধ্য অবদান রাখছেন। ঐ সব শিল্পোদ্যোক্তাকে সহজ শর্তে ঋণ, প্রযুক্তিগত সমর্থন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করে তাদের রপ্তানি-নির্ভর শ্রমনিবিড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করা হবে।

বহিঃবাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছাতে হলে ও বৈদেশিক সাহায্যের মাত্রা কমিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্রতী হলে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে :

(ক) দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির পদ্ধতি সহজতর করা হবে। আমদানি কর এই সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যুক্তির মাপকাঠিতে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

(খ) বিলাস দ্রব্যসহ সকল অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে।

(গ) দেশীয় শিল্প কারখানায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত দ্রব্যাদির আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে।

(ঘ) রপ্তানির ক্ষেত্রে অপ্রচলিত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে ও রপ্তানি বহুধাকরণের প্রচেষ্টা চালানো হবে।

(ঙ) রপ্তানির জন্য বিদ্যমান বাজার পুনর্বিন্যাস দ্বারা সুদৃঢ় করা হবে এবং নতুন বাজার খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালান হবে।

(চ) যে সকল শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা নেই, সেই সকল পণ্যের উৎপাদনে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে নতুন শ্রমনিবিড় শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

রাষ্ট্রীয় অনুৎপাদনশীল ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে সামাজিক অবকাঠামো যথা শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি প্রভৃতি খাতের উপর বর্ধিত হারে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ সব খাতের পরিমাণগত বিস্তৃতি যথেষ্ট নয়, বিষয় ও গুণগত মানের প্রতিও যথাযথ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সব খাতে ব্যয়কে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ হিসাবে দেখতে হবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে এ সব খাতের সুবিধাদি লাভ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। সার্বিকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ঐসব খাতের ভূমিকা হবে তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যক্রম কেবল মাত্র সরকারি বা সংগঠিত বেসরকারি উদ্যোগ-নির্ভর হয়ে পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ।

কৃষি ঋণ, ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎপাদনে ক্রমাবনতি, ফসলের দামের নিম্নগতি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কারণে চাষী আজ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে। এমতাবস্থায়–

* সময়মতো কৃষকের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি ঋণ তার কাছে পৌঁছানোর ব্যর্থতার দরুন কৃষি ঋণ বণ্টনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং তার ফলে কৃষকের হয়রানির সীমা থাকে না। তাছাড়া ঋণ বণ্টনের ব্যাপারে সামাজিক প্রতিপত্তি বা অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি ঋণের বৃহদাংশ একটি শ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়ার প্রবণতা ঋণ বণ্টন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষি ঋণ যাতে প্রতিটি চাষী, বিশেষ করে প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারদের ন্যায্য চাহিদা মেটাতে পারে তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

* পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ক্ষতি সাশ্রয়ের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল গঠন করা হবে।

* ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার মাধ্যমে ভূমির মালিকের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধান করে তাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা হবে।

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, গ্রামীণ দারিদ্র্যের অবসান এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব। যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের

সিংহভাগ জনসংখ্যা ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীর দলে এবং এদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ জন্য ভূমি সংস্কারের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য।

ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য চারটি :

(১) কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি;

(২) আয়ের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা;

(৩) ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

* ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন;

* সরকারি খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে গৃহীতব্য নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা;

* ভূমি ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ, উন্নত, দুর্নীতিমুক্ত ও যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন, যাতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

শ্রম নীতি

দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়ন একটি অন্যতম শর্ত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিক শ্রেণীর একনিষ্ঠ অবদান ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের একটি সুস্থ নীতি নির্ধারণ তাই অপরিহার্য।

* সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে শ্রমিকদের শ্রম সংগঠন প্রতিষ্ঠার অধিকার সংরক্ষিত হবে।

* রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বেসরকারি খাতে শ্রমিকদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাকল্পে মালিক, শ্রমিক ও অন্যান্য প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচনার মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হবে।

* শিল্প বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শিল্প শান্তি বিকাশের নিমিত্ত যৌথ আলাপ-আলোচনা, আপস-মীমাংসা এবং বিচার নিষ্পত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে।

* অনুসৃত শ্রম নীতিতে সম্পদের সাথে সংগতি রেখে শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রমকল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা হবে।
* আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনের বিধান মোতাবেক সমস্ত শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিসমূহের উন্নতি সাধন করা হবে।

ভৌত অবকাঠামো

* কৃষি, শিল্প তথা সার্বিক উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামোর ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। শুধুমাত্র আন্তঃনগর যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার নয়, বরং প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হতে হবে গ্রামাঞ্চলে সারা বছরের জন্য উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর। গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা হবে তাৎপর্যপূর্ণ– যা কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের সমন্বয় সাধন সুদৃঢ় করবে।
* যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা-গোমতী সেতুর প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
* অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদী সংস্কার ও রেলপথ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশাসন ব্যবস্থা

একটি স্বাধীন দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা যেমনি জনগণের কাছে দায়বদ্ধকর ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত, তেমনি জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি দক্ষ হাতিয়ার। এই উদ্দেশ্যে :
* প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করে তোলা এবং জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করা হবে। প্রশাসন যন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরূপে বিবেচিত হবে– সরকারের নয়।
* অর্থনৈতিক উন্নতির সামগ্রিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রশাসন যন্ত্রকে রদবদল অথবা পুনর্বিন্যাস করা হবে।

* ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসের একটি অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে।

* সরকারি কর্মকাণ্ডের অযৌক্তিক সম্প্রসারণ এবং সেই সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার প্রবণতাকে রোধ করতে হবে। জনগণ তাদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সৃজনশীল ও সক্রিয়– এই উপলব্ধি থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যম নিয়ে স্থানীয় সরকারগুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

দুর্নীতি

* **১৯৭৫** সাল থেকে দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন একনায়কত্বের কুফল হিসেবে দুর্নীতি সমাজ জীবনের সর্বস্তরকে আজ কলুষিত করে ফেলেছে। এর ফলে সামাজিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয়ের পাশাপাশি নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তা জাতীয় ও ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পঙ্গু করে ফেলেছে।

* দুর্নীতিকে জাতীয় বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে, এই অশুভ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন ও ধ্বংস করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে সংঘবদ্ধ সকল প্রচেষ্টা চালানো হবে এবং দুর্নীতিবাজ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা নীতি

দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি সুদক্ষ, শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর সেনাবাহিনী কর্তৃক এই পবিত্র দায়িত্ব সংবিধান বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী পালিত হবে।

* প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী নিশ্চিত করা হবে।

* প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

* শিক্ষা সুযোগ নয়– প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জাতীয় জীবন থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে হবে।

* অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি কার্যকর করতে হবে।

* বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরে প্রতিটি নাগরিকের সুযোগ-সুবিধার সমতা সাধন এবং দারিদ্র্য যাতে করে প্রতিভা ও মেধা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

* জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে ব্যাপকভিত্তিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

* শিক্ষকতা বৃত্তিকে আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরশীল বৃত্তি হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও শিক্ষকের মর্যাদা এবং সৎ জীবনযাপনের উপযোগী ন্যায়ানুগ বেতন ভাতা নির্ধারণ করা হবে।

* সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসনের আইনগত অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করা হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিক্ষাবছর সমাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

* বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালুকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের সকল কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রচলন করা হবে।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

* দেশের প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে দেশের সকল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিক করে গড়ে তোলা হবে এবং যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে চিকিৎসাকে বাস্তব অর্থে ফলপ্রসূ করে তোলা হবে।

* জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষণালব্ধ যথাযথ কৌশল অবলম্বন করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দেশের নারী সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন

* বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সে অর্থে যে কোন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরোধী।

* নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

* নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়নের উপযুক্ত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের ব্যবহার

* বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং তার ফলে বন্যার ভয়াবহ পরিণতি সমস্ত অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে, সেহেতু বন্যা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

* এই সমস্যা সমাধানে সমস্ত আন্তর্জাতিক কৌশলগত প্রচেষ্টার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা করে সত্বর জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

* পানি বণ্টনের প্রশ্নে বাংলাদেশের ন্যায্য জাতীয় চাহিদাকে সংরক্ষিত করে ভারতবর্ষের সাথে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধান নিশ্চিত করা হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

* পানি, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করতে হবে।

* বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে যে বিরাট আর্থিক লোকসান হচ্ছে তা রোধ করার জন্য উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

করলে একদিকে যেমন বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে এই খাতে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উপজাতি

* দেশের উপজাতিদের স্বীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সংরক্ষণ ও বিকাশের নিশ্চয়তা ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে।

আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তা

* গত পনের বছরের কুশাসনের ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, সাধারণ মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা, কালোবাজারি, চোরাচালান, নারী নির্যাতন, ছিনতাই, রাহাজানি, মাস্তানের দৌরাত্ম্য, বেআইনি অস্ত্রের ঝনঝনানি– সমাজ জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে তাদের দায়িত্ব পালনে সচেতন করে আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এই দুঃসহ অবস্থার অবসান নিশ্চিত করা হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণ

* মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার

* দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে যেসব রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, দিনমজুর আহত ও নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হবে।

পররাষ্ট্র নীতি

* জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই আওয়ামী লীগ স্বাধীন নিরপেক্ষ জোট-বহির্ভূত পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী। স্বাধীনতা, সমতা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে সমস্ত সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। 'সকলের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব এবং কারো প্রতি বৈরী মনোভাব নয়' এই মূল নীতি অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী।

* জাতিসংঘের সনদে উল্লেখিত নীতিসমূহ এবং উক্ত সনদে বর্ণিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি রয়েছে আমাদের পূর্ণ সমর্থন।

* আওয়ামী লীগ আগ্রাসনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরোধী এবং বিশ্বের নিপীড়িত, মুক্তিকামী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত জাতিসমূহের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থনে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

* জোট নিরপেক্ষ-আন্দোলন, ওআইসি ও সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব বজায় রাখা হবে।

উপসংহার

অবৈধ ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া বিগত পনের বছর স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছিল। গগনচুম্বী দুর্নীতি, ব্যাপক সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি জাতিকে এক অনিশ্চিত ও দুঃসহ অস্থিরতার মাঝে ঠেলে দিয়েছিল। সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের অবসান জাতির সম্মুখে এক অভাবনীয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এই সম্ভাবনা জনগণের সার্বভৌমত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা– একটি গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা– বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় দেশপ্রেম, আপোষহীন সংগ্রামী জীবনধারা ও তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত, পরিবর্ধিত ও পরিস্ফুটিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে আওয়ামী লীগ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ

হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতি ধাপে ধাপে সংগ্রামের মাধ্যমে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এরশাদকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করে। এই নির্বাচন এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গত পনের বছর এ দেশের জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, নির্বাচিত করতে পারেনি তাদের প্রতিনিধি। ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে জন প্রতিনিধিত্বহীন স্বৈরাচারী সরকার দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

আজ সুযোগ এসেছে জনগণের রায় প্রদান করার, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে দেশকে এক সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার। বিয়াল্লিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন একমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে। জনগণের সঠিক সিদ্ধান্ত ও রায়ের উপর আমাদের দৃঢ় আস্থা আছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি, অতীতের ন্যায় এবারও বাংলার সংগ্রামী জনগণ আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার সেলের পক্ষে মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক ৭০১ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং ৩০ (পুরাতন), ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।